বাংলাদেশ সরকারের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে
ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
ও
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

আয়োজিত

সাংবাদিক সম্মেলন

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/৭ জুন ২০১৪

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org

প্রাক্‌কথন:
বাজেট শুধু বাজেটই নয়; উন্নয়ন দর্শনের প্রতিভূ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে এবারের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের মর্মবস্তু সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য-বিশ্লেষণ-সুপারিশ উত্থাপনের আগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাক্‌কথন প্রয়োজন। বাজেট কোনো অনড়-স্থির (static) প্রক্রিয়া নয়, তা চলমান-গতিশীল (dynamic) একটি প্রক্রিয়া। আর এই চলমান-গতিশীল প্রক্রিয়ার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যসহ বিবর্তিত লক্ষ্যটি অনুধাবন অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য আমরা কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। আজ থেকে ৪৩ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো: **প্রথমত,** বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর **দ্বিতীয়ত,** অসাম্প্রদায়িক (secular) মানস কাঠামো বিনির্মাণ। এ দু'টোর কোনোটিই অর্জিত হয়নি; মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ৪৩ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে আমরা ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিক-ঠাকই শুরু করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তিন-চার বছরে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষী ছিলো। কিন্তু, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই আকঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়। এ ভূমিকাটুকু অন্ততঃ এ জন্যে প্রয়োজন যেন ইতিহাস সত্য কথা বলে। আর সত্যটি এরকম যে, যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারতো, যদি ১৯৭২-এর চার মূলস্তম্ভভিত্তিক সংবিধান বাস্তব রূপ নিতো, এবং সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার অন্যতম বিষয় কৃষিসহ বিভিন্ন ধরনের সমবায় ব্যবস্থা চালু হতো তাহলে আজকের বাংলাদেশ আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় মোট দেশজ উৎপাদন ও মাথাপিছু উৎপাদনে অনেক বেশি এগিয়ে যেতো এবং সেইসাথে মানুষে-মানুষে বৈষম্যও হ্রাস পেতো উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে আমাদের এবং মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন প্রায় সমপর্যায়ে ছিলো)। বঙ্গবন্ধুর হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সব ধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখি করে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state) পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তী কালের সেনা শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ– এ সবের

ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেনো চালকের আসনে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না– যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent Seeker) হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ করে ফেলেছেন। এটাই ১৯৭৫ পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো দুরূহ হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট আসলে কেমন হওয়া উচিত? নিঃসন্দেহে, ঐ বাজেট এমন হওয়া উচিত যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্লেখিত দু'টি বিষয় অর্থাৎ বৈষম্যহীন অর্থনীতি গঠন ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণের সহায়ক হবে। আর সঙ্গত প্রশ্ন সে বাজেট কিভাবে, কোন বিষয়কে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রণীত হতে হবে? প্রথমত, ঐ বাজেট হতে হবে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণার (Proclamation of Independence) সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ঐ বাজেট হতে হবে আমাদের ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আর এসবের ভিত্তিতেই প্রণীত হতে হবে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি-প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) যার ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five Year Plan); আর ঐ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি বছর প্রণীত হতে হবে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেট। সুতরাং, বাজেট দলিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পথনির্দেশক দলিল হবে এটাই স্বাভাবিক। যা বাস্তবায়িত না হলে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা বলা চলে তা হবে মুক্তি-স্বাধীনতার চেতনার সাথে সঙ্গতিহীন। এ অবস্থা আমাদের কোনো বাজেটেই কাম্য নয়।

আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল প্রণীত না হলে; সেই মোতাবেক পরিকল্পনা গৃহীত না হলে এবং বাজেট বিন্যস্ত করা না হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। বাজারব্যবস্থা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে চালু রয়েছে তা বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে: বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের

বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বাড়ছে সুপার ধনী। জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা– পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। আইন শৃংখলা সুস্থিত নয়। আইন-বিচার-সরকার-রাজনীতি বাস্তবত ক্ষমতাবানদের পক্ষে। দুঃশাসনের মাত্রাতিরিক্ততা সুশাসনকে কাগুজে বুলিতে রূপান্তরিত করছে। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে না গিয়ে আমরা চলেছি উল্টো পথে যদিও বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম **"সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ে বাংলাদেশঃ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়"**। প্রশ্ন– কার উন্নয়নের? জনগণের না'কি rent seeker-দের?

আমাদের সংবিধানে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এই লক্ষ্যে নীতি প্রণীত না হলে, পরিকল্পনা গৃহীত না হলে এবং বাজেট বিন্যস্ত করা না হলে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাজারব্যবস্থা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে। ধনী-দরিদ্রদের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল সবলের বৈষম্য বাড়ছে। দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের দুষ্ট চক্রের দৌরাত্ম্যে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ। আইন-শৃংখলার অবনতি অব্যাহত। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে তো আমরা যাচ্ছিই না বরং চলছি ঠিক উল্টো দিকে– সংবিধানের ঐ বাধ্যবাধকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গোষ্ঠী-ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান - সংবিধান বলছে। কিন্তু, দেখা যায় আইন অহরহ ক্ষমতাবানদের পক্ষে বিধান দিচ্ছে। বিভিন্ন জরিপ বলছে বিচার বিভাগেও ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজমান।

'সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা'– এ মূল নীতির মাধ্যমে এক সমতাভিমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে এখনো বহাল রয়েছে। সুতরাং, সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে বৈষম্য নিরসনমুখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে এবং দারিদ্র্য সৃষ্টির সকল উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু, বাজেটে যাই লেখা থাকুক না কেনো rent seeking-উদ্ভূত দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতির কাঠামোতে জনগণের কাছে সরকারি সেবা প্রকৃত বিচারে কতটুকু পৌঁছায় তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। উৎকোচ ব্যতিরেকে সরকারি সেবা মেলা ভার। সমাজ-অর্থনীতি উত্তরোত্তর অধিক হারে rent seeker-পুষ্ট সন্ত্রাসী ও অপরাধী উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির

দুর্বৃত্তায়ন ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সাধারণ জনগণের জীবন দুর্বিষহ। অথচ আমরা স্পষ্ট জানি– দুর্নীতি দারিদ্র্য-বৈষম্য পুনরুৎপাদন করে। এমনি একটি সংকটজনক প্রেক্ষাপটে আজকের এই বাজেট-উত্তর প্রেস কনফারেন্স।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে পনের কোটি মানুষের বাংলাদেশে **"দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন"** (home grown development philosophy) অর্থাৎ মানব উন্নয়ন দর্শনই হওয়া উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় দর্শন। কারণ, উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবে। স্বাধীনতার ঐ পাঁচটি ধরন হলো: অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়াতে হবে, আর অন্যদিকে প্রবৃদ্ধির ফল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মানব উন্নয়ন দর্শনের প্রতি আস্থা এবং এ দর্শন বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। যে প্রতিশ্রুতি দৃশ্যমান হতে হবে জাতীয় বাজেটে।

দেশের অর্থনীতি ও সমাজের সুষ্ঠু অগ্রগতির লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। প্রকট ও ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য বিরাজমান থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈষম্য নিরসন, সকলের জন্য ন্যায্যভাবে সামজিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ, ও সুবণ্টিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান। সমাজ রূপান্তরের সকল প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনভিত্তিক হতে হবে। আগেই বলেছি এদেশে আমরা এ ধরনের একটি সামাজিক বিবর্তন কাঠামো তৈরী করতে পারিনি। বাজেটেও তাই তার প্রতিফলন ঘটে না। কাজেই টেকসই উন্নয়নের কথা যে আমরা বলি আজ পর্যন্ত তা কথার কথাই থেকে গেছে। যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান তা সমাজ বিভাজক ও এর ফলে দেশে দীর্ঘ মেয়াদে বিশৃংখলা ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা অমূলক নয়।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে সরকারি বাজেটে অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রকৃত বিচারে আজো আমাদের সংবিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ মানব উন্নয়নকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব প্রদানের এই দর্শন প্রতিফলিত নয়। কারণ, বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণে প্রমাণিত যে সাধারণ প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতের মত অনুৎপাদনশীল কার্যক্রমে সরকারের ব্যয় অগ্রহণযোগ্যভাবে বেশি। প্রতিরক্ষা খাতের

'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণ 'অদৃশ্যমান' উন্নয়ন ব্যয় হয়ে থাকে তা যেহেতু আমাদের জানার উপায় নেই তাই আমাদের পক্ষে প্রতিরক্ষা খাতে মোট সরকারি ব্যয় শুধু অনুমানই সম্ভব। আমরা মনে করি বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের স্ফীতি মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতিকে প্রকৃত বিচারে বিঘ্নিত করে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ইস্যুটিকে আমরা যেভাবে দেখি তা'হলো– প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের সাথে মানব উন্নয়ন ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে ব্যাপক মাত্রার দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শ্লথ গতি এবং সরকারি ব্যয়-বরাদ্দে ভারসাম্যহীনতার কারণে ধাপে ধাপে প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। একথা আমরা বহুবছর ধরে বলে আসছি।

সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষত: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় এ-দুটো খাতে সরকারি ব্যয় অতি দ্রুত যথেষ্ট মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশে প্রবল। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি লাগাতারভাবে বলে আসছে যে, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। তা শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যেই নয়, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রিতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যেও। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কালো পথে উৎপাদনশীল খাত থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশিয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অথচ, এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগত অধিকহারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠির ধারক শিক্ষাব্যবস্থাকে এহেন দুর্যোগের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে একুশ শতকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখানো এক ভ্রান্ত ধারণা। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করার প্রয়াসে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করার হুজুগে মেতে উঠেছে, এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্যকে সমাজ জীবনে আরো দৃঢ়মূল করার আত্মঘাতী পথে অগ্রসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তাই নয়, গত প্রায় ৪০ বছরে (১৯৭৫ পরবর্তী

সময়ে) অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে এখন বাংলাদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসাগামী– এটা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ ফল। এহেন অবৈজ্ঞানিক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য পুনরুৎপাদন করছে অন্যদিকে তা সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপুষ্ট করছে।

স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যখন উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সাথে তুলনা করছে তখন এ খাত উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার সর্বনাশা প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হয়েছে– রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা সহায়তায়। সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকে আশ্রয় নিচ্ছেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প বরাদ্দ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচারণ ও জরাজীর্ণতার প্রতীক হয়ে আছে যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের শামিল।

আমরা এখন বিশ্বায়নের আওতায়। সাথে আছে বাজার অর্থনীতি আর বৈশ্বিক rent seeking ব্যবস্থা। বাজেটকে বলতে হবে বিশ্বায়নের এ যুগে আমরা কিভাবে সর্বোচ্চ উপকার পেতে পারি যা আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা দূরসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। একথা সত্য যে বিশ্বায়নের আওতায় বিশ্ববাণিজ্য, বৈশ্বিক সম্পদের চলাচল পারস্পরিক বিশ্ব-নির্ভরতাকে অনিবার্য করে তুলেছে। কিন্তু, বিশ্ব দারিদ্র্য-বৈষম্য হয়েছে ব্যাপক আর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায়ে টেকসই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এক প্রস্তাবনা। শুধু তা-ই নয়, প্রচলিত অন্যায্য এই বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বের দিকে দিকে জন্ম নিচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে প্রতিবাদী আবহ, কণ্ঠস্বর, বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনসহ জঙ্গি তৎপরতা।

নব্য-উদারতাবাদ যা প্রচলিত এই বিশ্বব্যবস্থার মূল দর্শন তা আজ ব্যাপকভাবে সমালোচিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ১৯৯২ সালে লিখেছিলেন নব্য-উদারতাবাদই চিরস্থায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। বলেছিলেন অন্য কোনো ব্যবস্থা একে কোনো দিন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে হঠাতে পারবে না। তিনিও এখন এই ব্যবস্থার কড়া সমালোচক। আর নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ ২০১৩ সালে বলেই বসেছেন– বিশ্বায়ন কাজ করছে না; বিশ্বায়ন সৃষ্টি করছে বৈশ্বিক rent seeking এক গোষ্ঠী; বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপি বৈষম্য বাড়াচ্ছে; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ত্ব আইন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি ইত্যাদি।

এই ব্যবস্থায় বিশ্বের নেতৃত্ব ও সকল ক্ষমতা ও বিশ্বসম্পদের সিংহভাগ থাকছে উন্নত বিশ্বের হাতে আর জাতীয় পর্যায়ে একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাধর (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক, ও সামাজিক) শ্রেণির হাতে থাকছে রাষ্ট্রের এবং অর্থনীতির সর্বময় কর্তৃত্ব।

বাংলাদেশও বিশ্বায়ন রথযাত্রার সহযাত্রী। বাংলাদেশ চীনের মত দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি, তবে দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য অত্যন্ত উঁচুমাত্রায় পৌঁছে গেছে এবং দ্রুত বাড়ছে। এই পথ টেকসই নয়। বিরাজমান বৈষম্যবর্ধক প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সংঘাত বাড়বে বই কমবে না। তাই উন্নয়ন দর্শনে শুধু বক্তৃতায় নয় কার্যকর সংস্কার জরুরি। আর তার মূল মন্ত্র হবে বিরাজমান ও বিকাশমান অ-টেকসই বাস্তবতার বিপরীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে বৈষম্য-নিরসনমুখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হতে হবে। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটিয়ে সরকারি সেবা সাধারণ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তথা সামাজিক বিবর্তনের সকল প্রক্রিয়ায় জন-অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে বসাতে হবে যেখানে স্বদেশজাত আর মানব উন্নয়নই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়।

নব্য উদারতাবাদের নিরংকুশ অনুসরণের কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থাও অনুরূপ জনকল্যাণকামী হতে সক্ষম হয় না। এটা নব্য উদারবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। সরকারি নীতি ও বক্তব্যে দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ স্বীকৃত হলেও সরকারি কর্মকাণ্ড মূলত: rent seeking গোষ্ঠীর আদেশ-নির্দেশে ক্ষমতাকাঠামোর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। দেশে আইনের শাসনের অভাব দৃশ্যমান। এছাড়া স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতারও অভাব সর্বত্র। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অকার্যকর। কেন্দ্রীভূত সরকার চায় না স্থানীয় সরকার কার্যকর হোক, শক্তিশালী হোক। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানেই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু (দেখুন: *সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১,৫৯,৬০*)।

এসবই কিন্তু সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রাক-লক্ষণ। সামগ্রিক পরিবেশ যা উল্লেখ-বিশ্লেষণ করা হলো সে অবস্থায় প্রকৃত মানব উন্নয়নকামী, বৈষম্য হ্রাসকারী জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন দুরূহ কাজ। কিছু কিছু বরাদ্দ পিছিয়েপড়া বিভিন্ন

গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হলেও তার সিংহভাগ মধ্যস্বত্বভোগীরা হাতিয়ে নেয়। উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছে সামান্যই। অধিকাংশ সময়ে তারা জানেনই না তাদের জন্য বাজেটে কি বরাদ্দ আছে, কোন খাতে এবং কেনো।

জনকল্যাণধর্মী জনঅংশীদারিত্বভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন তথা মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাই উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরি। যতদিন না তা ঘটে ততদিন গতানুগতিক বাজেট তৈরী হতে থাকবে এবং গতানুগতিকভাবে তা খন্ডিত আকারে এবং মূলত কিছু ক্ষমতাধর মানুষের স্বার্থে বাস্তবায়িত হবে। আর বিশাল পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী উপেক্ষিত থেকে যাবে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে আরো কিছু কথা: ভ্রান্তি; ধন্যবাদ; বাজেট নিয়ে মানুষ কি ভাবছে

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম **"সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ে বাংলাদেশ: উন্নয়নের ধারাবহিকতা"**। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করলেন তাতে প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/৫ জুন ২০১৪। আসলে যে কারণেই হোক বাজেট বক্তৃতায় প্রচ্ছদে উল্লেখিত বাংলা তারিখটি সঠিক নয়, তা হবে ২২ জ্যৈষ্ঠ (২১ জ্যৈষ্ঠ নয়)। আমরা মনে করি এ কোনো সাধারণ ভ্রান্তি নয়। এ ভ্রান্তি অমার্জনীয়!

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় মূল বাজেট পেশ করার পাশাপাশি জাতীয় সংসদ সদস্যদের টেবিলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রদান করেছেন যার মধ্যে বেশ কয়েকটি আগে কখনও দেয়া হয়নি। মূল বাজেট বক্তৃতার পাশাপাশি জাতীয় সংসদ সদস্যদের সামনে বাজেট ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রদানের জন্য অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ।

এ সব দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে প্রচলিত ধারার পাশাপাশি বাজেট ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যেসব প্রকাশনা উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো:

> (১) *সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি ২০১৩-২০১৪; (২) বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-১৫; (৩) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি; (৪) বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-১৫: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার; (৫) বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-১৫: মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (উন্নয়ন); (৬) বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-২০১৫: সংযুক্ত তহবিল– প্রাপ্তি; (৭) বাৎসরিক বাজেট ২০১৪-১৫: মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন); (৮) জেন্ডার প্রতিবেদন*

২০১৪-১৫ (৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ); (৯) বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাত উন্নয়ন: সাফল্যের অগ্রযাত্রা (জুন ২০১৪); (১০) ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা: হালচিত্র ২০১৪ (জুন ২০১৪); (১১) রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা (জুন ২০১৪); (১২) জেলাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ২০১৪-১৫ (খুলনা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট); (১৩) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭; (১৪) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪; (১৫) ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৩-১৪; (১৬) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৩-১৪ (পরিকল্পনা কমিশন); (১৭) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-১৫ (পরিকল্পনা কমিশন)। এসকল মোট ১৭টি প্রকাশনার মধ্যে ১৪টি অর্থবিভাগ (অর্থ মন্ত্রণালয়), ১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (অর্থ মন্ত্রণালয়), এবং ২টি পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত। গুরুত্বপূর্ণ এসব দলিল প্রণয়নের জন্য আবারো ধন্যবাদ। আমরা চাই এসব প্রকাশিত দলিলের তথ্যাদি বৃহত্তর জনগণকে অবহিত করা হোক এবং জনগণের মতামত নেবার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক।

এ বছরের বাজেট প্রণয়নের আগে প্রাক-বাজেট আলোচনায় ২৭ মার্চ ২০১৪/১৩ চৈত্র ১৪২০ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আমন্ত্রণে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে তার সাথে আলোচনা করি এবং সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ দেই (যা পরের অনুচ্ছেদে আছে)। এ ছাড়াও জন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর "তামাকের অর্থনীতি ও তামাক কর" সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবারের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা জাতীয় সংসদে মাননীয় ডেপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এবং সেই সাথে একই বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আমাদের গবেষিত বক্তব্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ উপস্থাপন করি। জনস্বাস্থ্যের অন্যতম বিষয় মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়েও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মাননীয় স্পিকারের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে আমাদের গবেষণা ফলাফলসহ সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করি। জনস্বাস্থ্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা (safe/clean/potable drinking water, hygienic sanitation, personal hygiene) বিষয়ে আমরা এখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বরাদ্দের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেটপূর্ব গবেষণাভিত্তিক প্রেস কনফারেন্স আয়োজন

করি এবং সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করি। পাশাপাশি ভূমি সংস্কার বিষয়েও আমরা আমাদের গবেষিত সুপরিশসমূহ অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করি। কিছুটা আশার কথা হলো এসব উচ্চ পর্যায়ের আলাপ-আলোচনা-সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ এ বছরের বাজেটে কিছুটা হলেও গুরুত্ব পেয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির মাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আমাদের প্রস্তাবিত চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বাজেটে তুলনামুলক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিষয় চারটি হলো:

১. গত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাস্তবায়ন অবস্থা এ বছরের বাজেটে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা,

২. গত বছর বাজেটে ছিল না অথচ 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে জরুরি এমন কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশসহ পথনির্দেশ দেয়া,

৩. জেলাভিত্তিক বাজেট সকল জেলার জন্য প্রণয়ন করা; এবং

৪. জেন্ডারভিত্তিক বাজেট প্রতিবেদনসহ নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রণয়ন করা।

এসবের অর্থ হলো বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নতুন রূপ দৃশ্যমান– যার প্রয়োজনীয়তা আমরা গত কয়েক বছর ধরে লাগাতার সুপারিশ করে আসছি।
উল্লেখ্য, আমাদের উল্লিখিত প্রস্তাবনা-সুপারিশসমূহের মধ্যে যে বিষয়টি আদৌ কোনো গুরুত্ব পায়নি তা হলো ভূমি সংস্কার– ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য নিরসনে খাস জমির বণ্টন এবং ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন। আর যে বিষয়টি স্বল্প গুরুত্ব পেয়েছে তার মধ্যে আছে মাতৃস্বাস্থ্যের অপ্রতুল বরাদ্দ এবং সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ইত্যাদি। (এসব পরবর্তী সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে)।

এবারের বাজেট সম্পর্কে দেশের মানুষ কি ভাবছেন তা বলা দুষ্কর। তবে দৈনিক জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকার শিরোনামসমূহকে যদি বাজেট নিয়ে মানুষের ভাবনার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয় (যদিও পত্র-পত্রিকার নিজস্ব রাজনৈতিক সম্পাদকীয় পলিসি আছে) সেক্ষেত্রে বাজেট নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনার রূপ-বৈশিষ্ট্য বুঝতে বাজেট পরবর্তী দিনের পত্রিকার শিরোনামসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই বাজেট

পরবর্তী দিনের দৈনিক পত্রিকাসমূহ বাজেট নিয়ে কি শিরোনাম করেছে– তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আত্মতুষ্টির কৌশলী বাজেট (আমাদের অর্থনীতি), *বকেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের বাজেট* (আমাদের সময়), *প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি* (আলোকিত বাংলাদেশ), *বিপুল ঘাটতি বড় আশাবাদ* (কালের কণ্ঠ), *এ যেন নির্বাচনী বাজেট* (নয়া দিগন্ত), *বিশাল বাজেট, বড় চ্যালেঞ্জ* (ভোরের কাগজ), *বিশাল ঘাটতির সাধ্যহীন সাধের বাজেট* (ভোরের ডাক), *প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে বিশাল ব্যবধান: উপেক্ষিত ৩০ লাখ বিনিয়োগকারীর পুঁজিবাজার* (শেয়ার বিজ), *দারিদ্র বিলোপের বাজেট* (দৈনিক জনকণ্ঠ), *সাহসী লক্ষ্য, নড়বড়ে ভিত* (প্রথম আলো), *রাজনীতি সামলানোর বাজেট* (বাংলাদেশ প্রতিদিন), *প্রত্যাশার বড় বাজেট* (বাংলাদেশ সময়), *সমৃদ্ধির বাতাবরণে অর্থনৈতিক চাপ* (বণিক বার্তা), *আশাবাদের বিশাল বাজেট* (মানব কণ্ঠ), *মেগা বাজেট: বিশাল ঘাটতি, ঋণের বোঝা আরও বাড়বে* (মানবজমিন), *চমকহীন গতানুগতিক বাজেট* (যায়যায়দিন), *বাজেটে কর ভ্যাটের জাল (*যুগান্তর), *ভিত্তি দুর্বল আকাঙ্ক্ষা প্রবল (*সমকাল), *বড় আশার বিশাল বাজেট (*সকালের খবর), *সাড়ে ৬৭ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট* (সংবাদ), *চ্যালেঞ্জিং টার্গেট: ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার বাজেট: বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রত্যাশা* (দৈনিক ইত্তেফাক), *রূপকল্পের বাজেট* (দৈনিক ইনকিলাব), *বিশাল বাজেটে বাড়বে করের বোঝা* (দৈনিক জনতা), *লক্ষ্য স্বপ্ন পূরণ* (দৈনিক আজকালের খবর), *আড়াই লাখ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা: ঘাটতি ৬৭ হাজার কোটি* (দৈনিক দিনকাল), *প্রস্তাবিত বাজেট ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা* (দৈনিক নবরাজ), *সম্ভাবনাময় আগামীর পথনির্দেশ* (দৈনিক বর্তমান), *ঋণনির্ভর ৬৭ হাজার ৫৫২ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট(*দৈনিক সংগ্রাম), *Tk 2,50,506cr ambitious budget* Daily Sun), *Plans massive, paths obscured* (Dhaka Tribune), *Muhith banks on hope* (Independent), *Tk 2,50,506cr budget proposed* (New Nation), *Muhith widens taxes in high-deficit budget* (NEWAGE), *Muhith*

unveils Tk 2,50,506 crore budget (The Bangladesh Today), *Goal higher, route unclear* (The Daily Star), *Muhith unveils mega budget for fiscal 2015: Ambiguity, populism mark a pro-growth approach* (The Financial Express), *Tk 2,50,506cr investment-friendly budget* (The News Today), *Hefty budget targets high growth* (Observer).

এ তালিকা আসলে গুরুত্বহীন কোনো তালিকা মনে করলে ভুল করা হবে। সাধারণ মানুষ তাদের পরিবারের বাজেট ঠিকই বোঝেন কিন্তু দেশের বাজেট বোঝেন না। সাধারণ মানুষের কাছে বাজেট মানেই নতুন এক ভীতির পূর্বাভাস। আর ভীতিটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ভীতি, জীবন ধারণের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ভীতি, কর্মসংস্থান কমে যাবার ভীতি, প্রকৃত আয় কমে যাবার ভীতি পরিবার পরিচালনে হিমসিম খাওয়ার ভীতি। আর তার সাথে যদি জীবনের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে তা হলে তো কথাই নেই– ভীতি গুণিতক হারে বাড়ে। মানুষ মনে মনে চায় বাজেটের কারণে যেনো তাদের এসব ভীতি না বাড়ে। আমরাও সেটাই প্রত্যাশা করি।

আসলে গত কয়েক বছর ধরেই আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের সমিতির প্রাক-বাজেট প্রেস-কনফারেন্সে আমরা বলে আসছি "*দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দিন বদলের সংস্কৃতি*"। আমরা বলেছি এ রূপান্তর এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে "বদলের নির্দেশকারী" দলিল। এ কথা বিবেচনায় রেখেই আমরা বলেছি বাজেট হতে হবে "*দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত দলিল*"। আমরা দৃঢ়চিত্তে বলেছি রূপকল্প ২০২১ সহ দেশের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ-অবস্থা যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারি ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা, যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। আমরা অত্যন্ত জোর দিয়েই বলেছি *দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের*। বাজেট সম্পর্কে আমরা এ কথাও বার বার বলেছি যে "ভালো অর্থনৈতিক নীতি হলো তা যার সামাজিক অভিঘাত ধনাত্মক"। আর এ বছর আমরা আমাদের প্রাক-বাজেট আলোচনায় বলেছিলাম "সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য– দেশে একটি অর্থনৈতিকভাবে সচল, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক

কল্যাণ রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাজেট একটি। সমাজ বিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ বাঞ্ছণীয়"। জাতীয় উন্নয়ন ও বাজেট বিবেচনায় রেখেই এখন থেকে দুই বছর আগে (১৯ জুলাই ২০১২) বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনারে যথেষ্ট হিসেব-পত্তরসহ যুক্তি উপস্থাপন করে "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ" এর কথা আমরাই প্রথম বলেছিলাম। আমরা বার বার একথাও বলেছি যে, বাংলাদেশের আজকের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্ত; তা ক্রমাগত আরো শক্তিশালী হচ্ছে; এবং এ ভিত্তি প্রসারণের মাধ্যমে আমরা বহুদূর এগুতে সক্ষম।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা কি সুপারিশ করেছিলাম

গত ১৩ চৈত্র ১৪২০/২৭ মার্চ, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়-এর অর্থবিভাগের সভাকক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর সাথে বাজেট প্রণয়নের নীতিগত বিষয়সমূহের উপর মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রতিনিধি দল ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করেন:

১. ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট পেশকালে বর্তমান সরকারের গত মেয়াদের (২০০৯-২০১৪) বাজেট অভিজ্ঞতা তথা অর্থনীতির সাফল্য-ব্যর্থতার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ স্বচ্ছতার নিশ্চিতকরণে থাকা উচিত।

২. গত দু'টি অর্থবছর (২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪) বিরোধী দলসমূহের হরতাল-অবরোধ-নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী কর্মসূচির কারণে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য আগামী অর্থবছরের বাজেট হতে হবে উচ্চ প্রবৃদ্ধিমুখী ও যৌক্তিক।

৩. বর্তমান সরকারের গত মেয়াদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের অর্জন কম নয়–এসব অর্জন সামনের বাজেটে ধরে রাখতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল খাত-ক্ষেত্রে অধিকতর অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। এসব অর্জনের মধ্যে আছে: অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা; মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস; বহি:স্থ সেক্টরের চাপ হ্রাস; প্রবাসিদের প্রেরিত অর্থের প্রবাহ; রাজস্ব আয় বৃদ্ধি; বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি; সরকারি বিনিয়োগ; মুদ্রাখাতের

অর্জন এবং টাকার তুলনামূলক শক্তিশালী অবস্থান; শিক্ষা বিশেষত: নারী শিক্ষার প্রসার; শিশু-মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস; নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট দিকসমূহ; অনিশ্চয়তার মধ্যে টিকে থাকার সক্ষমতা ইত্যাদি। আসন্ন বাজেটে এ সব সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

৪. উচ্চ প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে জাতীয় বিনিয়োগ হার বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক নৈরাজ্যের কারণে গত দুই অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগের শ্লথগতি বেগবান করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

৫. বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ ও পিপিপি বিনিয়োগ বাড়ানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. গত মেয়াদে বর্তমান সরকারের অংগীকারকৃত অথচ গত মেয়াদে অবাস্তবায়িত সকল বৃহৎ প্রকল্পের কাজ যত দ্রুত সম্ভব শুরু ও সমাপ্ত করা উচিৎ।

৭. প্রবৃদ্ধির প্রতিফলে বণ্টন-ন্যায্যতা নিশ্চিত করা দারিদ্র্যরোধের অন্যতম হাতিয়ার। ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে এ দিকে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি। প্রবৃদ্ধির উৎস শক্তিশালী করতেও এ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৮. খাদ্য মূল্যস্ফীতিসহ খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির রশি টেনে ধরতে পারলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৭%-এর নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব।

৯. গত ২/৩ বছর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত সংকোচনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংকোচনমূলক ব্যবস্থা অর্থনীতির গতি হ্রাস করতে পারে। সরকারকে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস না পায়, বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়; আবার মূল্যস্ফীতি হ্রাস করা যায়। এ ক্ষেত্রে কার্যকর মুদ্রা নীতির পাশাপাশি যথোপযুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি ও বাজার হস্তক্ষেপ কাম্য। সেইসাথে লক্ষ্য অর্জনে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। আমরা সব সময় বলেছি, "মুক্ত বাজার অর্থনীতি দরিদ্র বান্ধব নয়"।

১০. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের হাতে একটি হাতিয়ার হলো টিসিবির মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগপণ্য আমদানি করে তা ন্যায্যমূল্যে বিতরণ করা। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে এমনভাবে পুর্নবিন্যাস করে টিসিবিকে উত্তরোত্তর কার্যকর করা উচিত। আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে বাজার তদারকি এবং সেই আঙ্গিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রথম মেয়াদে সরকারের নির্বাচনী অংগীকার: মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তা স্বার্থরক্ষাকারী পদক্ষেপ সম্পর্কে বাজেটে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ থাকতে হবে।

১১. বর্তমান সরকারের গত মেয়াদে কৃষি উৎপাদন ভালো হয়েছে এবং পাশাপাশি সরকারের ওএমএস কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছিল। ওএমএসসহ অন্যান্য ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, যাতে চালের মূল্য সাধারণ মানুষের কাছে সহনীয় পর্যায়ে থাকে।

১২. ধানের বাজারমূল্য হ্রাস পেলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষক যাতে ন্যায্যমূল্য পায়, উৎপাদন খরচ পুষিয়ে নিতে পারে, সেদিকেও সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার যৌক্তিকমূল্যে শস্য সংগ্রহ ছাড়াও কৃষক ক্লাব গঠন, গ্রোয়ার্স মার্কেট, পাইকারী বাজার স্থাপন, খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। এসমস্ত কার্যক্রম গত মেয়াদে কতটুকু কার্যকর ও সফল হয়েছে, তা আসন্ন বাজেট ঘোষণায় অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত।

১৩. দারিদ্র্য–বাংলাদেশের অন্যতম অভিশাপ। দারিদ্র্য হারের নিম্নমুখী প্রবনতা নিয়ে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই, কারণ দারিদ্র্য বহুমুখী। বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন ধরণের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্য ভান্ডার (ডাটা বেইস) গড়ে তোলা জরুরি। দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরন ভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম ঠিকানার সাথে যেখানে অর্ন্তভুক্ত হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভুত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভুত দারিদ্র্য, ভৌগলিক অবস্থান জনিত দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের এ ধরনের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে এবং তা কার্যকরী করার বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৪. ঘাটতি অর্থায়ন –একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। সরকার অঙ্গীকার করেছিল, এটা যেন জিডিপি-র ৫ শতাংশের বেশি না হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কমিয়ে নয়, বরং সরকারের আয় বাড়িয়ে ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয় কমিয়ে বাজেট ঘাটতি কমানো উচিত।

১৫. ঘাটতি বাজেট অর্থায়নে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা যেমন কমাতে হবে, তেমনি কমাতে হবে দেশিয় ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা। ঘাটতি অর্থায়নে দেশিয় ব্যাংক-বহির্ভূত উৎসসমূহের কার্যকরী সম্পৃক্ততা নিয়ে বাজেটে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৬. ইদানীংকালে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অর্থছাড়সহ অন্যান্য ব্যয় মেটাতে সরকারকে ব্যাংক উৎস থেকে প্রায়ই প্রচুর ঋণ

গ্রহণ করতে হয়েছে। এর ফলে দুই ধরণের সমস্যা তৈরী হয়– একদিকে মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ কমে যায়। সরকার যাতে পরিমিত পরিমাণে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেয়, সেদিকে নজর দেয়া দরকার।

১৭. ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ঘাটতি অর্থায়ন–অর্থনীতির সার্বিক কল্যাণে অবদান রাখে। এ লক্ষ্যে একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট (সেকেন্ডারী মার্কেট সুবিধাসহ) প্রতিষ্ঠা জরুরি। এর ফলে সরকারী বন্ড কেনা-বেচায় জড়িত প্রাইমারী ডিলার(ব্যাংক)'রা যেমন একদিকে তারল্য সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পাবে আর অন্যদিকে আর্থিক বাজারে price discovery (সুদের হার নির্ধারণ) ও সম্ভব হবে।

১৮. প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারি বিনিয়োগ এর গুরুত্ব সরকারি বিনিয়োগের চেয়ে বেশী। অন্যদিকে বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ অনেকাংশে ব্যাংক নির্ভর। সেজন্য ব্যাংকিং তথা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ইদানীংকালে সংঘটিত ব্যাংকিং জালিয়াতিসমূহ সক্রিয় বিবেচনায় নিয়ে সরকারের উচিৎ একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা আর অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সুসংহত করা। বেসরকারি বিনিয়োগ নিম্নমুখী হওয়ার পিছনে ব্যাংকিং খাতের অস্থিরতাও একটি অন্যতম কারণ। বিষয়টি বাজেটে গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।

১৯. স্থানীয় বিল ক্রয় (আইবিপি) নিয়ে যে ব্যাংকিং জালিয়াতি হয়েছে, তা বিরাট আকারের। এর সমাধান বা সুরাহা আশু প্রয়োজন। এ বিষয়টিসহ রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকসমূহের বেসরকারিখাতে ঋণ প্রদান সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

২০. অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বনিয়োজিত কর্মকাণ্ড অর্থায়নের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন অর্থায়নেও ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে একটি উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফান্ড গঠন করা যেতে পারে।

২১. সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি ব্যালেন্স শীটও থাকা উচিৎ। পরবর্তীতে এগুলোর সামগ্রিক যোগফলই হবে সরকারের ব্যালেন্স শীট। বিষয়টি এবারের বাজেটে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

২২. কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দেশজ শিল্পায়ন ত্বরান্বয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

২৩. সকল বিত্তবান/সচ্ছল ব্যক্তিকে আয়করের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যের আলোকে জরিপ চালাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, দেশে ১০ লাখ কর দাতার কোন হদিস নেই। কর আয় বাড়ানোর জন্য এনবিআর-এর মানব ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সম্পদ কর (সম্পদ মূল্য নির্ধারনের উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ), withholding ট্যাক্স-ইত্যাদি কার্যক্রম সরকার শুরু করতে পারে।

২৪. বর্তমান অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয় কাঙ্খিত পর্যায়ে উপনীত হবে না। কিন্তু অন্যদিকে ব্যয় কমছে না। সরকারি ব্যয় কমানোর সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে জনপ্রশাসন সংস্কারের কাজটি গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নেয়া জরুরি। বাজেটে এর প্রতিফলন থাকা উচিত।

২৫. গত মেয়াদে বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো সরকারের রাজস্ব আহরণ। গত পাঁচ বছরে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। অধিক থেকে অধিকতর রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা অব্যাহত রাখতে হবে।

২৬. বিগত কয়েক অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের গতিধারা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রত্যক্ষ করের অবদান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে আয় বৈষম্য নিরসনে এটা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য, এধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

২৭. নিম্ন আয়ের মানুষের অবস্থা বিবেচনায় এনে আয়কর রহিত সীমা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রবীণ জনগোষ্ঠি ও নারীর ক্ষেত্রে আয়কর রহিত সীমা ৩ লাখ টাকা প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে এ সীমা আরো বাড়ানো যেতে পারে।

২৮. কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী কোম্পানি নিবন্ধনের সময় পরিচালকদের TIN থাকা আবশ্যক। কোম্পানির TIN প্রতিবছর নির্দিষ্ট অংকের ফি প্রদানের মাধ্যমে নবায়ন করার প্রথা চালু করলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ ব্যবসা পরিচালনে উৎসাহিত হবে।

২৯. সকল TIN ধারীর রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন করা যেতে পারে।

৩০. শতভাগ বাজেট বাস্তবায়ন-সরকারের অঙ্গীকার। অঙ্গীকার চলমান থাকতে হবে। আরো জরুরি হলো বাস্তবায়নের গুণগত মান। বছরের শুরু থেকেই উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল গ্রহণ/শক্তিশালী করার দিকনির্দেশনা বাজেটে থাকতে হবে।

৩১. উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উচ্চ হারে বিনিয়োগ যা নির্ভর করে অবকাঠামোগত সুবিধা ও সুশাসন-এর উপর। বৃহৎ পরিবহনগত অবকাঠামো, যেমন: পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন ও অন্যান্য প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারকে কালক্ষেপণ না করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।

৩২. রেলওয়ের বাজেট ভিন্ন ভাবে দেখাতে হবে এবং রেলওয়ের বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি।

৩৩. নদী পথের নাব্যতা নিশ্চিতকরণ-উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ড নিয়ে মৌলিক ভাবনা জরুরি। এ ক্ষেত্রে অন্যান্যের মধ্যে দেশে ৩০০-র অধিক মরা নদী খনন-এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ি আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে।

৩৪. স্বল্প মেয়াদী রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে মাঝারি ও বড় ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রতি নজর দেয়া উচিত। নিজস্ব জ্বালানিব্যবস্থা ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৩৫. ধনী-দরিদ্র ভর্তুকি বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। কৃষি ভর্তুকি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অক্ষুন্ন রেখেই ভর্তুকি কমাতে হবে। ধনিক শ্রেণিমুখী ভর্তুকি তুলে দেয়া উচিত।

৩৬. আমাদের উন্নয়ন বাজেটে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি খাত। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানো ও ভর্তুকিসহ অবকাঠামো উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি গ্রামীণকৃষি বহির্ভূত খাতগুলোর উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সরকারী কর্মসূচি যেমন: একটি বাড়ী-একটি খামার, কর্মসৃজন ইত্যাদির বাস্তবায়ন গতি বাড়াতে হবে।

৩৭. গত মেয়াদের ন্যায় এবারও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষির বহুমুখীকরণ (মাছ, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি) এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণহীন কৃষিভূমি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। একই

সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য "কৃষি বীমা" চালুর সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে ।

৩৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (বাধ্যতামূলকভাবে সকল সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কর্তৃক গ্রামীণ অর্থায়ন, বর্গাচাষী অর্থায়ন ইত্যাদি) চালু রাখতে হবে ও আরও বেগবান করতে হবে ।

৩৯. আইলা-সিডর-মঙ্গা-চর-হাওর-বাওর এলাকায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে সুদহীন স্বল্প মেয়াদি (৬ মাস) ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে (এটি পরীক্ষিত কর্মসূচি) । এ ঋণ প্রদান হবে মূলত: কৃষিজ উপকরণ (সার, সেচ, বীজ ইত্যাদি) ক্রয় সহায়তার মাধ্যমে স্বয়ংভর কৃষি অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ।

৪০. কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । বর্তমানে আমরা জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করি । এ সরকারের অন্যতম অর্জন নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অর্থ-বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে বাড়াতে হবে । গত মেয়াদে সরকারের অঙ্গীকার ছিল শিক্ষা ও বিজ্ঞানখাতে সর্বোচ্চ রাজস্ব বরাদ্দ । তাছাড়া, শিক্ষকদের জন্য একটি স্থায়ী পে-কমিশন ও পৃথক সার্ভিস কমিশন হওয়ার কথা ছিল । এ সম্পর্কে আসন্ন বাজেটে সরকারের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা উচিৎ ।

৪১. গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে । নগর দরিদ্র মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে । বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত মেয়াদে প্রতিশ্রুত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সুসংহত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্চনীয় । গ্রামীণ স্বাস্থ্য বীমা চালু করা যেতে পারে ।

৪২. সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদানসহ ক্ষমতায়িত করে । এ লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে এবং এগুলো যাতে সঠিকভাবে প্রকৃত দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে । আগামী অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির আওতা বাড়ানো প্রয়োজন । কারণ, এমূহুর্তে মাত্র ২৫ ভাগ খানা এ সুবিধা পেয়ে থাকে । সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী পরিচালিত হতে হবে দান-ভিত্তিক নয় অধিকার ভিত্তিক এপ্রোচ-এর দৃষ্টিতে ।

৪৩. বর্তমান সরকারের গত সবকটি বাজেটে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অগ্রগতির চিত্র ব্যাখ্যাসহ আগামী বাজেটে এক্ষেত্রে অগ্রগতি তরান্বিত করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

৪৪. বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলা আছে। অন্য দিকে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সুতরাং, দারিদ্র্য নিরসন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে খাস জমি প্রদান এবং প্রকৃত জেলেদের খাস জলা প্রদান জরুরি।

৪৫. সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি গত মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল।

৪৬. জনস্বাস্থ্য গবেষকরা জানান, সরকারের উদার করনীতির জন্য বাংলাদেশে তামাকসেবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সিগারেটের ক্ষেত্রে মোট ৪টি সম্পূরক কর স্ল্যাব আছে। এ স্ল্যাব কর ফাঁকি উদ্বুদ্ধ করে। স্ল্যাব পদ্ধতি উঠিয়ে একক (unified) স্ল্যাব করে গড় খুচরা মূল্যের ৭০ শতাংশ করারোপ (আবগারী শুল্ক/সম্পুরক কর) করলে সরকারের অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে ২,০০০ কোটি টাকা এবং অন্যদিকে সিগারেটসেবীর সংখ্যাও কমে যাবে এবং হ্রাস পাবে সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা ও অকাল মৃত্যু। একই ভাবে বিড়িসহ অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বাড়াতে হবে।

৪৭. ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু, সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহের কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে সনোফিল্টারের সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

৪৮. সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা (clear/safe water, hygienic sanitation, person hygiene) খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রতিশ্রুত অগ্রাধিকারের তুলনায় স্বল্প। আর এ খাতের বরাদ্দ প্রধানত: বড় শহরমুখী। এ খাতে একদিকে বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে, আর অন্যদিকে গ্রামসহ প্রান্তিক-সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় (চর, হাওর, বাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, পাবর্ত্য এলাকা, শহরের বস্তি) বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য বৈষম্য হ্রাস করতে হবে।

৪৯. পরিবেশবান্ধব বাজেট বাস্তবায়নের জন্য শুধু অর্থমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও আর্থিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ন ও সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কার্যকলাপ প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

৫০. জেন্ডার বাজেট গত মেয়াদের একটি বড় অর্জন। তাছাড়া, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণীত হয়েছে। আমরা দেখছি বছরের শুরুতে বাজেটে নারীর জন্য প্রকল্পের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু, আমাদের জানা হয়না বাস্তবে এর কতখানি কার্যকর হয়েছে। এটি নির্মোহ পরিবীক্ষণের প্রয়োজন। এই পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যায় একটি জাতীয় পর্যায়ের মনিটরিং কোষকে যেখানে থাকবেন জেন্ডার বাজেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধি, সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি।

৫১. গ্রামে অথবা শহরে নারীর জীবন যন্ত্রণাময়–বাল্য বিয়ে, যৌন হয়রানি, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন এসবই নারী এককভাবে সহ্য করে। এসব প্রতিরোধে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ইতোমধ্যে সিডও সনদের অনুসরণে "পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০" জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। তবে এটি ব্যবহারের জন্য বিধি প্রণয়নের কাজটি আরও দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা দরকার।

৫২. নারীর সাংসারিক কাজের ফলে যে মূল্য সংযোজন হয়, তার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দানের উদ্যোগটি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। টেকসই অর্থনীতিসহ নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার স্বার্থে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এ কাজে অগ্রসর হয়েছে। নারীর অস্বীকৃত কাজের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নারীকে ক্ষমতায়িত করবে, সমাজে সম্মানিত করবে এবং ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতনের মত কঠিন সমস্যাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃত হবে।

৫৩. জেলা বাজেট প্রণয়ন এ সরকারের একটি অর্জন। একটি জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহের জন্য যা বরাদ্দ তা নিয়ে জেলা বাজেট না করে একটি জেলার সমস্ত স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় জেলা প্রশাসনের বাজেট একীভূত করে জেলা বাজেট তৈরী করা উচিৎ।

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১/৫ই জুন, ২০১৪ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় **"বিগত দিনের সফলতার আলোকে আগামীর পথ রচনা"** শিরোনামকৃত দ্বিতীয়

অধ্যায়ে গত মেয়াদে বর্তমান সরকারের মোটা দাগের অর্জনসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও, বাজেট বক্তৃতার পরিশিষ্ট-ক তে বিগত পাঁচ বছরে বর্তমান সরকারের সম্পাদিত কর্মসূচিসমূহ, পরিশিষ্ট-খ তে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহ এবং পরিশিষ্ট-গ তে প্রতিশ্রুত কর্মসূচি যেগুলো বাস্তবায়ন শুরু করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, তা তুলে ধরে জবাবদিহিতার পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্লেষকদের মধ্যে বর্তমান সরকারের সফলতা-ব্যর্থতার মাত্রা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তারপরও এ কথা অনস্বীকার্য যে, অকপটে ব্যর্থতা স্বীকার করা বাজেট প্রণয়নে সরকারের দায়বদ্ধতা ও প্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য সরকারের বাজেট ঘোষণার পর্যালোচনা ও সুপারিশ পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাব ও সরকারের বাজেট ঘোষণার মধ্যে দুরত্ব আছে, তবে সে দুরত্ব গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যেই আছে। অকপটে সরকারি ব্যর্থতা স্বীকার করা, রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধির হার, এডিপির বাস্তবায়ন হার বাড়ানোর পদক্ষেপ, ঘাটতি অর্থায়ন হ্রাস করা তথা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ কমিয়ে আনা, সম্প্রসারণশীল বাজেট আকার, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্পর্কিত প্রস্তাবনাসমূহ স্পষ্টভাবে মেনে চলতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে, বাজেটের কোন দুর্বলতা বা downside ঝুঁকি নেই। চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়নে সেগুলো অবশ্যই বিবেচনায় এনে কার্যকর আরও কিছু পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করে বাজেটকে এর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাজেটের অনুমান ভিত্তি

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে যে সকল বড় মাপের বিষয়কে বাজেটের অনুমান ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে তা হলো বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও অনুমান, মূল্যস্ফীতি , মুদ্রা ও ঋণ, আমদানি ও রপ্তানি, প্রবাস আয় ও জনশক্তি রপ্তানি, এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হার। প্রকৃত অর্থে এবারের বাজেট প্রণয়নে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্গত কয়েকটি অনুমানসহ চলমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

এবারের বাজেটের প্রক্ষেপণ ভিত্তিসমূহ নিয়ে কিছু বলা জরুরি। বাজেটে যেসব ভিত্তি ধরে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত ফল হিসেব করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

১. উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে ঐসব দেশে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তাদের বেকারত্ব কমছে এবং ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ছে।

২. আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানি মূল্য হ্রাস পাবে।

৩. বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৪ সালে হবে ৩.৬% আর ২০১৫ সালে ৩.৯%। উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহে ঐ প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৬.৭% ও ৬.৮%।

৪. গত অর্থবছরের দ্বিতীয় ভাগে হরতাল অবরোধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও আমাদের GDP প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.০১% (২০০৫-০৬ ভিত্তি বছর ধরে)। শিল্পখাতে ১০% প্রবৃদ্ধি হয়েছে; কৃষিতে কিছু কমেছে; সেবাখাতে আশানুরূপ হয়নি। প্রবাস আয়ের কারণে ব্যক্তিখাতে ভোগ ব্যয় বাড়লেও বিনিয়োগ বেশি বাড়েনি। এ তুলনায় সরকারি খাতে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য বেড়েছে।

৫. রপ্তানি বাড়লেও আমদানি ততটা বাড়েনি।

৬. হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের পরিপূরক নীতি সহায়তার ফলে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উৎসাহ বাড়বে। শিল্প ও সেবা খাত উজ্জীবিত হবে।

৭. আউশ ও বোরো ধানের ফলন কৃষি প্রবৃদ্ধি বাড়াবে।

৮. হরতাল ও অবরোধের কারণে পণ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে; সামনে কমে আসবে।

৯. ব্যাংকিং খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে আমানত ও সুদের ব্যবধান কমেছে (৫%-এর কাছাকাছি)।

১০. কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতসহ প্রবৃদ্ধি-বান্ধব খাতসমূহে প্রয়োজনীয় ঋণপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে।

১১. বহিঃখাতের উন্নতির সাথে সাথে মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

১২. রপ্তানি বেড়েছে (চলতি এপ্রিল পর্যন্ত)। গত বছর পণ্য ও সেবার আমদানি ব্যয় হ্রাস পেলেও চলতি মার্চ পর্যন্ত তা বেড়েছে (১৭.৫%)।

১৩. প্রবাস আয় কমেছে (গত অর্থবছরে ১২.৬% প্রবৃদ্ধির বিপরীতে চলতি ২০১৩-১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ৪.৮% কমেছে)। তবে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যেসব পদক্ষেপের মধ্যে আছে কুটনৈতিক তৎপরতা,

আর্থিক সহায়তা প্রদান, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, জি টু জি পদ্ধতিতে জনশক্তি রপ্তানি, বেসরকারি চ্যানেলকে উৎসাহিত করা ।

১৪. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে (২৭ মে ২০১৪ তে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ।

১৫. মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রয়েছে ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের প্রক্ষেপণ ভিত্তির ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কাঙ্ক্ষিত ফল যা হতে পারে সে সম্পর্কে বাজেট সংখ্যাবাচক যা বলছে তা নিম্নরূপ:

১. জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি হবে ৭.৩% ।

২. সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৪ নাগাদ হবে ৭%; আগামী অর্থবছরে তা আরো কমে আসবে ।

৩. প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে ব্যাপক মুদ্রা ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রসার হবে ।

৪. রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই ১৫% বাড়তে পারে ।

৫. প্রবাস আয় স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসবে ।

৬. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে (বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও প্রাবাস আয়, ঋণ-সহায়তা ও বিদেশি বিনিয়োগে ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে) ।

৭. বদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে ।

এবারের বাজেটে সামনের অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস নিয়ে বলা হয়েছে: সামনের বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো গতিশীল হওয়ার সাথে সাথে আমাদের রপ্তানি, বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে । অনুমান করা হচ্ছে সামনের বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য ও জ্বালানির মূল্য কিছুটা কমবে । উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখা হবে এবং বিনিয়োগ সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হবে । বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বন্দর ও যোগাযোগ খাতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে । মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ থাকবে । রাজস্ব, আর্থিক খাত ও পুঁজি বাজারে সংস্কার কার্যক্রম চলবে । বিদেশি বিনিয়োগ ও সহায়তা বাড়বে । কৃষিতে ঋণ ও উপকরণ সহায়তা বজায় থাকবে । এরপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী

সবচে' গুরুত্ববহ যে কথাটি বলেছেন তাহলো– **"সর্বোপরি, আমি অনুকূল আবহাওয়া ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছি"** ।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সু-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অনেক । আমাদেরও তার চেয়ে কম নয় । তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের দু'টো প্রশ্ন:

প্রথমত, কি সেই শক্ত ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি বললেন অথবা ভাবলেন অথবা প্রক্ষেপণ করলেন যে আগামি বছরে আর্ন্তজাতিক বাজারে খাদ্যশস্য ও জ্বালানির মূল্য কমবে; বিনিয়োগ সহায়ক মুদ্রানীতি (?) অনুসরণ করা হবে (বিনিয়োগ সহায়ক মুদ্রানীতিটা আসলে কি); মানব সম্পদ উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হবে (এসবের আসলে সুনির্দিষ্ট মানে কি, কি করা হবে, কি করা হবে না); পুঁজিবাজার সংস্কার কার্যক্রম চলবে (এর অপারেশনাল মানেটা কি আর ঐ সংস্কারের সম্ভাব্য ফল কি এবং তা কবে নাগাদ ফলপ্রসু ফল প্রসব করবে); বিদেশি বিনিয়োগ ও সহায়তা বাড়বে (এরই বা আসলে অর্থ কি; কিভাবে তা ফলপ্রসু হবে; যেখানে দেশিয় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে তেমন উৎসাহ পান না সেখানে বিদেশিরা কি জন্যে আসবেন; বিদেশিদের কি এমন সহায়তা দেয়া হবে যার ফলে তারা আসবেন যে সহায়তা দেশীয় বিনিয়োগকারীদের দেয়া যায় না?) । এসব নিয়ে বাজেটে তেমন কোনো পথনির্দেশনা নেই ।

দ্বিতীয়ত, বাজেটে জিডিপি-র ৭.৩% প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সবচে গুরুত্বপূর্ণ যে বাস্তব সত্যটি উল্লেখ করেছেন বলে আমরা মনে করি সেটা হলে তার উক্তি **"সর্বোপরি...রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছি"** । তার ঐ এক উক্তিই দেশের বর্তমান অবস্থায় সবচে' প্রণিধানযোগ্য । যা আগামী দিনে সামনে হয়তো বা আরো সত্য উক্তিতে রূপান্তরিত হবে । তাই যদি হয় তাহলে শুধু ৭.৩% প্রবৃদ্ধি নয় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার অনেক আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থেকে যাবে । আমরা মনে করি এবারের বাজেটে **"রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছি"** বিষয়টি নিয়ে আরো খোলামেলা কিছু কথাবার্তা বলতে পারতেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী । কারণ প্রচলিত অর্থে বাজেট এক অর্থনৈতিক দলিল (আসলে আয়-ব্যয়ের হিসেব) একথা সত্য । কিন্তু, বাংলাদেশের চলমান প্রেক্ষিতে বাজেটকে হতে হবে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক-অর্থনীতির পথনির্দেশকারী দলিল ।

অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেক গুরুর মতে প্রক্ষেপণের (পূর্বাভাসের) অনুমান ভিত্তি বেশির ভাগ সময়ই কাজ করে না। যে কারণে বলা হয় "অর্থনীতিবিদদের কাজ হলো গত কাল অনুমানের ভিত্তিতে যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিলো তা কেন আজ কাজ করলো না সে বিষয়ে ভবিষ্যতে বিচার-বিশ্লেষণ করা"– এসব কথা সত্য হতে পারে যখন প্রক্ষেপণের অনুমান ভিত্তি হয় বাস্তবতা বিবর্জিত। বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ও দুর্বল দিকসমূহসহ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বিভিন্ন সমীকরণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব যে সঞ্চয় হার যখন ক্রমবর্ধমান (এমন কি বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি), যখন বিনিয়োগ স্থবিরতা দূর হবার লক্ষণসমূহ স্পষ্ট, যখন রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়, যখন রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ার লক্ষণও স্পষ্ট, যখন কৃষির গতি বাড়ছে, যখন মেয়াদি শিল্প ঋণ বাড়ছে, যখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে, যখন অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নীতি কৌশল বিনির্মিত হচ্ছে, যখন বহি:স্থ-চাপ এড়ানোর সক্ষমতা বাড়ছে, যখন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, যখন বিনিয়োগে সম্ভাব্য "ভীতি ফ্যাক্টর" কমছে এবং সেইসাথে যখন বাড়ছে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও সুরক্ষার উপাদান–এ অবস্থায় বাজেটের অনুমান ভিত্তিসমূহ আমাদের মতে কাঙ্খিত মাত্রায় যুক্তিসংগত এবং বাস্তবসম্মত। তবে আমরা মনে করি যে, যেসব ফ্যাক্টরকে অনুমান-ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছে এবং/অথবা হয়নি তার মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, দুর্নীতি, সুশাসন, গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং সর্বোপরি rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়ন (যখন রাজনীতি ও সরকার rent seeker-দের অধীনস্থ সত্ত্বায় রূপান্তরিত হন)। এসব ফ্যাক্টরে বড় ধরনের বিপত্তি না হলে প্রতিশ্রুত অর্জন অসম্ভব নয়। তবে কাঙ্ক্ষিত/প্রক্ষেপিত অর্জনের ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর **"সর্বোপরি...রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছি"** উক্তিটি বিশেষ বিবেচনায়– ভাবনার– উদ্রেকের কারণ হতে পারে।

বাজেটের আয় ও ব্যয় – আমাদের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে একটি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭) আওতায়। মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব মধ্যমেয়াদি বাজেট

প্রস্তুত করে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। বর্তমান সরকারের গত মেয়াদের ন্যায় এ মেয়াদের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের মূল লক্ষ্য রূপকল্প ২০২১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এ সরকার যে বিষয়গুলোর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, তা বাস্তবায়ন করা। অর্থমন্ত্রীর ভাষায়, "রূপকল্প ২০২১ (বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করা) কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম এ মেয়াদেও তা অব্যাহত থাকবে"। স্বচ্ছতার স্বার্থে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের সাথে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা নির্ণয় করার জন্য পূর্ববর্তী ৩টি অর্থবছরের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া , ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া জেলা (টাংগাইল) বাজেট, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৭টি জেলার জন্য বিস্তৃত করা হয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ উন্নয়ন বাজেটের প্রায় দ্বিগুণ, যদিও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের আকার ৩০% বেশী।

এ বছর বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৮.৭%) যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১৬% বেশি। যেখানে অনুন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট খাতের মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২৭১ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১১.৯৬%), উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ৮৬ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৬.৪%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ৮০ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৬.০%)। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর প্রক্ষেপণ, বাজেটের আকারের সাধারণ গতিধারা এবং মূল্যস্ফীতির নিরিখে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ যেমন একদিকে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হবে তেমনি অনুন্নয়ন ব্যয়ের ১৫ শতাংশ আসলে দারিদ্র্য দূরীকরণ উদ্দিষ্ট উন্নয়ন ব্যয় (প্রধানত: অতি দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচির ব্যয়)। এ বছর বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ হল সুদ পরিশোধ ব্যয় বাড়বে, কৃষি ভতুর্কিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভতুর্কি দিতে হবে, সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাড়ার কারণে বর্দ্ধিত সুদ পরিশোধ করতে হবে।

এ বছর বাজেটে প্রাক্কলিত মোট আয় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৪.১২%)। যার মধ্যে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৭%)। মোট রাজস্ব আয়ের ১ লক্ষ ৫৫ হাজার

২৯২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৫৯%) আসবে কর-রাজস্ব হিসেবে যার মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ১৪৯,৭২০ কোটি টাকা অর্থাৎ জিডিপি-র ১১.১৭%, আর কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আয় হবে ২৭ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০৬%)। অর্থাৎ রাজস্ব আয়ের ৮৪.৮৮% আসবে কর রাজস্ব থেকে।

আমাদের বাজেট–একটি ঘাটতি বাজেট, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। মোট প্রাক্কলিত ঘাটতির পরিমাণ ৬৭ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৫.০%)। ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক সূত্র থেকে আহরণ করা হবে ২৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৪৩ হাজার ২৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি পূরণে ৫৬% নির্ভর করতে হবে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া হবে ৩১ হাজার ২২১ কোটি টাকা এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নেয়া হবে ১২ হাজার ০৫৬ কোটি টাকা (যার বেশির ভাগ আসবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে)। এ ক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো ঘাটতি বাজেটের সাথে মূল্যস্ফীতি তেমন সহ-সম্পর্কিত নাও হতে পারে যদি ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে উৎপাদনশীল খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। এ দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যদিও এমুহূর্তে ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচুর অতিরিক্ত তারল্য বিদ্যমান, তথাপি খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ৩১ হাজার কোটি টাকা নিলে (যার প্রায় ৬৩% দীর্ঘমেয়াদের)–সেক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্যের উপর চাপ বাড়বে যা নিঃসন্দেহে সুদের হার বাড়াবে; এবং ফলশ্রুতিতে প্রবৃদ্ধির প্রধান সহায়ক খাত শিল্প খাতের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আর সেই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পেতে পারে।

বাজেট জনকল্যাণকামী এবং ভারসাম্যপূর্ণ কি'না-এ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা মোট বাজেটের (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) এবং সে সাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ বিন্যাস সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। এটা অনস্বীকার্য যে, বাজেটকে হতে হবে উন্নয়নের দিক নির্দেশনার দলিল।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন নিয়ে যে মোট বাজেট তার ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট বক্তব্য দিতে চাই। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট বরাদ্দে অগ্রাধিকারক্রম অথবা প্রাধান্যক্রম নিম্নরূপ: সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **ভৌত অবকাঠামো** যার অন্তর্ভুক্ত সার্বিক কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, বৃহত্তর যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি–এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ৩০.১৫%। দ্বিতীয় সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **সামাজিক অবকাঠামো** যার অর্ন্তভুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট–এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ২৫.১৬%। তৃতীয় সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **সাধারণ সেবাখাত**-এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ২৩.৫৮%। চতুর্থ সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **সুদ পরিশোধ**-এ খাতে

বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ১২.৩৯% । পঞ্চম স্থানে আছে **নীট ঋণদান ও অন্যান্য** ব্যয়-মোট বরাদ্দের ৫.৩৪% এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ স্থানে আছে **পিপিপি ভর্তুকি ও দায়**-মোট বরাদ্দের ৩.৩৭% । আমাদের মতে মোট বরাদ্দের এ অগ্রাধিকারক্রম অযৌক্তিক নয় । উল্লেখ্য যে, গত অর্থবছরের (২০১৩-১৪) তুলনায়, বর্তমান অর্থবছরে সামাজিক অবকাঠামো খাতে ২% ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে এবং কমেছে নীট ঋণদান ও অন্যান্য খাতে, যা বাজেট ব্যয় বরাদ্দে ভারসাম্য বাড়াবে ।

মোট বাজেট বরাদ্দের খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকারক্রম বা প্রাধান্যক্রম অন্যভাবে আরো একটু বিস্তারিত দেখা যেতে পারে । এ বিশ্লেষণে বরাদ্দক্রম নিম্নরূপ : সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত, জনপ্রশাসন (মোট বরাদ্দের ১৫.২৬%); এর পরে আছে যথাক্রমে শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১৩.০৮%),সুদ (১২.৩৯%), পরিবহন ও যোগাযোগ (৯.৭৫%), কৃষি (৭.৬২%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৭.০৭%), প্রতিরক্ষা (৬.৫৭%), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৬.০৬%), জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা (৫.০১%), জ্বালানী ও বিদ্যুৎ (৪.৬০%), স্বাস্থ্য (৪.৪%), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (১.১%), গৃহায়ন (০.৮%), বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (০.৮%) এবং বিবিধ ব্যয় (৫.৩%) । গত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে (২০১৪-১৫) পরিবহন ও যোগাযোগ এবং কৃষি খাতের বরাদ্দ অনেক বেড়েছে । সুদ খরচের চেয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে । গত অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের অবস্থান তৃতীয় হলেও এ অর্থবছরে আনুপাতিক বরাদ্দ বৃদ্ধির কারণে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত দ্বিতীয় অবস্থানে এসেছে । বরাবরের মত জন প্রশাসন খাত সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য খাতের অবস্থান অনেক পিছনে । এ অবস্থা কাম্য নয় ।

আবার শুধু মাত্র অনুন্নয়ন বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাচ্ছে **সুদ পরিশোধ** খাত (মোট অনুন্নয়ন বাজেটের ১৮.৪%); তার পরে যথাক্রমে আছে জনপ্রশাসন (১৫.৭%), শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১০.৯%), ভতুর্কি ও প্রনোদনা (৯.৯%), প্রতিরক্ষা (৮.৫%), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৬.১%), জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা (৫.৯%) পেনশন (৫.০%), পরিবহন ও যোগাযোগ (২.৬%), কৃষি (২.৪%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (১.৫%), বিনোদন-সংস্কৃতি-ধর্ম (০.৭%), গৃহায়ণ (০.৫%), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (০.৩%), এবং বিবিধ (৮.০%) । অনুন্নয়ন বাজেটের খাতওয়ারি এ বরাদ্দ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের **প্রায় ৬৮%** । তাছাড়া, গত অর্থবছরের তুলনায় বতর্মান অর্থবছরে খাতওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ মোটামুটি একই রকম ।

৮০ হাজার ৩১৫ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-র বরাদ্দ বিন্যাসে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত হচ্ছে সার্বিক কৃষি খাত (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট)-এ খাতের অংশ ২৫.৪%; এর পরেই আছে শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদ–এ খাতের অংশ ২৪.৩%,যোগাযোগ অবকাঠামো–এ খাতের অংশ ২৩.৩%, পরবর্তীতে আছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ১৪.৩% এবং অন্যান্য ১২.২৫% । উন্নয়ন-কর্মকাণ্ড নিশ্চিতকরণে এ অগ্রাধিকারক্রম যৌক্তিক। উল্লেখ্য যে, গত অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (গত বছর বরাদ্দ ছিল ৬,৮৫২ কোটি টাকা)। "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু"-র প্রবক্তা হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এজন্য একটু গর্ব করতেই পারে ।

প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোর যে বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করছি তাতে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে এ কাঠামো 'রূপকল্প ২০২১' বিনির্মাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই আমরা মনে করি মোট বাজেটের যে কাঠামো-বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে তা যেন পরিবর্তিত না হয় এবং একই সাথে তা যেন পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়–এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সমন্বিত নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

চূড়ান্ত বাজেটের জন্য আমাদের সুপারিশ

১. জাতীয় বাজেট–উন্নয়ন-এর দিকনিদের্শক দলিল। সে কারণেই চূড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট হতে হবে যে বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশল সংশ্লিষ্ট যে সব দিক নিদের্শনা প্রতিফলিত হয়েছে তার ফলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির কোনটি কি মাত্রায় অর্জিত হবে :

   ১. বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;

   ২. অধিকতর কার্যকরি, বৈচিত্রপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি;

   ৩. অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা;

   ৪. শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব;

   ৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার;

   ৬. নারীর ক্ষমতায়ন (অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক);

৭. বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগী হ্রাস এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান;

৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার;

৯. জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর (মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ইত্যাদি);

১০. শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত (শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয় উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ);

১১. সুসংগঠিত সামাজিক ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম (সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার–সেফটি নেট থেকে শস্য বিমা পর্যন্ত);

১২. রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর; এবং

১৩. রাষ্ট্রীয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ

(উন্নয়ন হবে আন্দোলন) ।

(সূত্র: আবুল বারকাত,লোকবক্তৃতা ২০১৪, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি)

২. বরাবরের মতোই বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মত এবং মানসম্মত বাস্তবায়ন । বাস্তবায়ন কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সূচারুভাবে প্রতিপালন করতে হবে-অন্যথা হলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকতে হবে । বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস সম্ভব হবে । এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা, সমন্বয় ও পরীবিক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন ।

৩. এবারের বাজেটে সামনের অর্থবছরের জন্য মোট প্রকৃত দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.৩ শতাংশ । স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় উল্লিখিত "অনুমান"সমূহ নিশ্চিতকরণে সমন্বিত পদক্ষেপসহ উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা বাড়ানো যায় ।

৪. বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা–এক বাস্তবায়নযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে বাজেট বিশ্লেষণ হল: এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে এবং একই সাথে প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য হ্রাসমান। সুতরাং, এ দিক থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে পারে। আর অন্যদিকে সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি আপাতত: স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা যায়। শুধু সহায়ক মুদ্রানীতি নয়, সাথে সাথে অন্য কিছুও ভাবতে হবে-যে পথে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে, যে পথে অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং একই সাথে কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাবেন, এবং যে পথে বৈষম্য-হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

৫. রাজস্ব আয় বৃদ্ধি আর একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। প্রস্তাবিত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা কর আদায়ের পদ্ধতি ও সূত্র পরিস্কারভাবে বলা হয়নি। পেশাজীবি consulting, outsourcing, ডাক্তারের chamber, Law firm, Accounting firm সমূহের fee income account payee cheque -এর মাধ্যমে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে। Accounting firm এর সকল প্রকার আয়ের উপর ২৫% ট্যাক্স প্রযোজ্য। দেখা যায় এসব ফার্মের statutory audit fee মূল আয়ের সর্বোচ্চ ২৫% বাকী ৭৫% Consulting, IT, HR এর outsourcing activity থেকে আসে। অবশিষ্ট ৭৫% উপর করপোরেট কর হার প্রয়োগ করা উচিত। তাতে সরকারের আয় বাড়বে।

৬. বর্তমান পদ্ধতিতে cost price এর ভিত্তিতে সম্পত্তির কর হার প্রয়োগ করা হচ্ছে যা নিতান্তই কম। সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন প্রতি ৩ বছর পর পর করা যেতে পারে। পূন:মূল্যায়িত সম্পদের উপর কর ধার্য্য করা উচিৎ। প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রত্যেক ৩-৫ বছর মেয়াদে প্রতি municipal এলাকায় সম্পত্তির মূল্য পূন মূল্যায়ণ করা হয়। পুনর্মূল্যায়িত সম্পত্তির উপর সম্পদ কর হার প্রয়োগ করলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৭. সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে মন্ত্রণালয়গুলো এই আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করে না। পাইলট ভিত্তিতে একটি মন্ত্রণালয় Model Financial Statement তৈরী করে তা মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পর এ Model অনুযায়ী বাকী ৩৮টি

মন্ত্রণালয়ে তা Replicate করা যেতে পারে। সব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরনী এক করে কেন্দ্রীয় সরকারের Consolidated Financial Statement তৈরী করা যেতে পারে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অন্তত ১টি মন্ত্রণালয়ের Financial Statement তৈরী করার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া দরকার। পরবর্তী বছরগুলোতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৮. কর প্রশাসনের আওতা জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নেয়া প্রয়োজন। ICT এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা কনসালটিং কোম্পানি নিয়োগ করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে করদাতা শুমারি করা অতীব জরুরি, নিয়োজিত ফার্মকে Specific Terms of Reference দিয়ে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশের করদাতা শুমারি এবং সম্পদ শুমারির কাজ সম্পাদন করে আগামী বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৯. আমরা গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের প্রতি সম্মান রেখে Fiscal officer-দের discretionary power সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে ঘুষ নীতির কালো হাত ভেঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব করছি।

১০. অনুন্নয়নমূলক খরচ কমানো বিশেষ করে জনপ্রশাসনের ব্যয় কমানো, অপচয় কমানো ইত্যাদি সম্পর্কে বাজেটে সুস্পষ্ট দিক নিদের্শনা নেই। এসব বিষয় চূড়ান্ত বাজেটে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।

১১. বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য দৃঢ় ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে জাতীয় বিনিয়োগ স্বল্পতা (Investment gap) দূর করা সম্ভব নয়। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম পথ অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ ব্যবসা-ব্যায় (cost of doing business) কমিয়ে আনা। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ বিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ হলো: শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাপ্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, আইন-শৃংখলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল", বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধে সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-

কাস্টমসসহ দলিল-দস্তাবেজ সহজীকরণ, ব্যবসা-দ্রুতায়ন সংশ্লিষ্ট নীতিসহায়ক পদক্ষেপ ইত্যাদি ।

১২. পুজিঁবাজার উন্নয়নকল্পে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন । তথাপি পুজিঁ বাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ফিরে আসা এখনও দৃশ্যমান নয় এবং পুজিঁবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বর্তমান সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ । সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ২০১০ সালের পুঁজিবাজার ধসের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কারসাজি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ । তাছাড়া এ মূহূর্তে পুজিঁবাজারের সমস্যা শুধু সরবরাহ ঘাটতি নয় । চাহিদা স্বল্পতাই বরং প্রকট আকার ধারণ করেছে । পুঁজিবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ । তবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে সরকারী ও কর্পোরেট বন্ড মার্কেট সৃষ্টি করা উচিৎ । এর ফলে একদিকে stock market এর উপর নির্ভরশীলতা কমবে অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণে সক্ষম হবে । ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে Mutual Fund এর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন । বিষয়সমূহ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ জরুরি ।

১৩. বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা মূলত: ব্যাংক নির্ভর । দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেটের সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয় । এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি "ব্যক্তি খাত"-এর অর্থায়ন যাতে কোন অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন না হয়, তার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে । নিকট অতীতে সংগঠিত ব্যাংকিং জালিয়াতিসমূহ আগ্রহী ব্যাংকারদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহী করছে আবার অন্যদিকে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের অভাবে এবং ঋণের উচ্চ সুদ হারের কারণে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যেও ঋণ গ্রহণের উৎসাহ কম । এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারকে একসাথে নীতি-কৌশল উদঘাটন করতে হবে । ব্যাংকিং শৃংখলা নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর মুদ্রানীতি ও ঋণনীতি হতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে উপযুক্ত রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি ।

১৪. কৃষিখাতের অর্জনসমূহ ধরে রাখার জন্য নিশ্চিত করা জরুরি যেন কৃষি ভর্তুকি হ্রাস না পায় এবং একই সাথে যেন ভর্তুকি-বৈষম্য হ্রাস পায়। সেই সাথে আমরা এও মনে করি যে প্রস্তাবিত বাজেট বছরেই কৃষি ও কৃষক ভাবনার যর্থাথতা বিচারে ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার একর কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব; আর পাশাপাশি ২০ হাজার জলাহীন প্রকৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার একর খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেয়া সমিচিন।

১৫. যদিও বর্তমান সরকারের গত মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো–এবারের বাজেটে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। আমরা মনে করি চূড়ান্ত বাজেটে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ স্থির করা প্রয়োজন।

১৬. সকল TIN ধারীর (ব্যক্তিগত এবং কোম্পানি) রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন করা যেতে পারে।

১৭. এ দেশে আনুমানিক ৫০ জন ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করেন। আমাদের হিসেবে বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর দেবার যোগ্য মানুষের সংখ্যা এদেশে কমপক্ষে ৫০,০০০ জন। অর্থাৎ এদের কাছ থেকেই ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে বছরে কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। আর এ অর্থ ব্যয় হতে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট খাতসমুহে। আশা করি বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে বিবেচনা করা হবে। এ উৎসটিও হতে পারে নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু বিনিমার্ণের অন্যতম সুদবিহীন উৎস।

১৮. এবারের বাজেটে অতি দরিদ্রদের তালিকা (hard core poor listing) প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা জরুরি যে, দারিদ্র্য হার হ্রাস নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই, কারণ দারিদ্র্য বহুমুখী। বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার (ডাটা বেইস) গড়ে তোলা জরুরি। দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরন ভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম ঠিকানাসহ অর্ন্তভুক্ত হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য,

সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারী প্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, ভৌগলিক অবস্থান জনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি। দারিদ্র্যের এ ধরনের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে চূড়ান্ত বাজেটে বরাদ্দসহ দিক নির্দেশনা থাকা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

১৯. এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সুবিধা পাবার যোগ্য খানার সংখ্যা ২ কোটি যাদের ৭৫% এ সুবিধে বঞ্চিত। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এ খাতটি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সামগ্রিক বিচারে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ এবং পরিধি (coverage) এখনও তুলনামূলক কম। আমরা মনে করি জনকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে চূড়ান্ত বাজেটে এ খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২৫% বৃদ্ধি করা জরুরি। সেইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা প্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এবং একই সাথে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন যেন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর "অন্তর্ভুক্তি ভ্রান্তি" (inclusion error) দূর করা যায়। চূড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা জরুরি।

২০. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেইসাথে শিক্ষার স্তর ভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল ইত্যাদি, এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্ন দেখানো উচিত।

২১. জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে মনিটরিংব্যবস্থা থাকতে হবে। চূড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।

২২. বিগত দুই অর্থবছরসহ বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। পরিবেশ বান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

২৩. কালো টাকা অথবা মার্জিত ভাষায় অপ্রদর্শিত আয়ের বিষয়টি স্পর্শকাতর। আমাদের মতে এ দেশে পুঞ্জিভূত কালো টাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৫ লাখ কোটি থেকে ৭ লাখ কোটি টাকা (অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে জিডিপি-র ৪২%–৮০%)। বিষয়টি বাস্তব সত্য। এ অর্থ উদ্ধার প্রয়োজন। একদিকে

এমন কোন পথ-পদ্ধতি অবলম্বণ করা উচিত হবে না যার ফলে সৎ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অসৎ হতে প্রণোদিত হতে পারেন। অন্যদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে কালো টাকা সংশ্লিষ্ট "সিজর ইফেক্ট" কিভাবে সমাধান করা যায় বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে থাকা জরুরি। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর এবং ১০ শতাংশ ফাইন দিয়ে আবাসন খাতে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ আছে। দেশের মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানের এ ফর্দ ভাল ফর্দ নয়; তদুপরি মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন প্রণোদনা দিলেও কালো টাকা বেরুচ্ছে না। দেশে পুঞ্জিভুত কালো টাকার পরিমাণ যেহেতু অনেক (জিডিপি-র ৪২%–৮২%) এবং যেহেতু উৎপাদনশীল বিনিয়োগ-এর চাহিদা অনেক বেশী সেহেতু শক্ত শর্তে কালো টাকার গন্তব্যস্থল হিসেবে অবকাঠামো খাতের রাস্তাঘাট-ব্রিজ-বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ শিল্প খাতের কথা (বিশেষত শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ) ভাবা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার একদিকে যেমন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেন, অন্যদিকে একটি কমিশন গঠন করতে পারেন। আমরা আশা করবো চূড়ান্ত বাজেটে এ কমিশনসহ শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা থাকবে।

২৪. গবেষণায় প্রমাণিত যে, সিগারেট ও বিড়ির ক্ষেত্রে মূল্যস্তরভিত্তিক কর কাঠামো বাতিল করে সমহারে এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হলে প্রায় ৭০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক সিগারেট সেবনকারী এবং ৩৪ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক বিড়ি সেবনকারী ধূমপান ছেড়ে দেবেন। ৭১ লক্ষ তরুণ সিগারেট এবং ৩৫ লক্ষ তরুণ বিড়ি সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। বর্তমান মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সিগারেটের কারণে ৬০ লক্ষ এবং বিড়ির কারণে ২৪ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। এছাড়াও, সরকার সিগারেট থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি ও বিড়ি থেকে ৭২০ কোটি টাকা বাড়তি (অতিরিক্ত) রাজস্ব আহরণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, আমাদের এই হিসেবের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন চিবিয়ে খাওয়া-মুখের মধ্যে রাখা তামাকজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হলে অকালমৃত্যু রোধের সম্ভাবনা ও সরকারের কর-রাজস্ব আয় আরো অনেক বাড়বে। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো সিগারেটের ৪ স্তর বিশিষ্ট মূল্য স্তর তুলে দিয়ে গড়-পড়তা খুচরা মূল্যের উপর ৭০ শতাংশ এক্সাইজ কর আরোপ করা হোক (যা তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষরকারী দেশ)।

২৫. জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৫ (MDG-5) এ মাতৃস্বাস্থের উন্নয়ন-এর কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে মাতৃমৃত্যু সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৫৭৪ জন থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে/প্রসবে) নামিয়ে আনতে হবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৮৬ কোটি টাকা। কিন্তু, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ মাতৃমৃত্যু কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন বছরে ৬১৭ কোটি টাকা। সেজন্য আমাদের প্রস্তাব এখাতে বরাদ্দ কমপক্ষে দ্বিগুণ করা হোক।

আমাদের কিছু শেষ কথা

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে ভৌগলিক স্থানান্তর ঘটছে যার ভিত্তিতে আছে বড় আকারের মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-এর প্রাপ্যতা। সামনের ২০/২৫ বছরে আমরাও পারি বিশ্ব অর্থনীতিতে উচ্চ আসনে আসীন হতে। বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে আমাদের এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রয়োজন মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্ভাসিত গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব এবং সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যে নেতৃত্ব এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় **"সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা"**-কে সর্ব্বোচ অগ্রধিকার ভিত্তিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবে। আর এ সব সম্পদের মধ্যে আছে (১) **মানব সম্পদ–** যেখানে জন-সংখ্যাকে জন-সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে এবং যে ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষায়, জনস্বাস্থ্যে, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট খাত-ক্ষেত্রে, (২) **ভৌত সম্পদ–** সব ধরনের ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ-জ্বালানি, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভাট ইত্যাদি, এবং (৩) **প্রাকৃতিক সম্পদ–** জমি-জলা-জঙ্গলসহ গ্যাস-তেল-কয়লা-বঙ্গোপসাগর-আকাশ-মহাকাশ। এ সব সম্পদের সমন্বিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ফলপ্রদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়োগিক ভাবনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা ফলপ্রদতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যত উন্নয়ন-বিকাশ-প্রগতি নিয়ে নূতন এ দর্শন চিন্তার বিকল্প নেই। এ দর্শন চিন্তাটিও চূড়ান্ত বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ-এর স্বপ্ন দেখছি। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ যা এবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী অনেকবার উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন "...এদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি প্রযুক্তি নির্ভর, সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গঠন"; তিনি আরও কথা বলেছেন "বাংলাদেশের সম্ভাবনা অপরিমেয়", "এই অপরিমেয় সম্ভাবনার স্বার্থে আমরা চাই একটি অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র।" 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নসহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতির উচ্চস্তরে পৌছে দেবার এ বিনির্মাণ এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে এ বিনির্মাণের পথ-কৌশল। এ নিরিখে এ বছরের বাজেটে বেশ কিছু সাহসী, স্বচ্ছ, লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ রয়েছে। একারণেই এ বছরের বাজেট আশা সঞ্চারণকারী দলিল। এবারের বাজেট অনেক দূর পর্যন্ত "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত" দলিল। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে। 'রূপকল্প ২০২১' যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে **প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, তরুণ প্রজন্মকে সাহসি ও আলোকিতকরণের, নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের**। দেশের মাটি উত্থিত এ দর্শনটি বাস্তবায়নে নিঃসন্দেহে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে– তা হলো Rent Seeker-দের হাত থেকে সরকার ও রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে; সে অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যখন সরকার ও রাজনীতি যেন Rent Seeker-দের অধীনস্থ না হয়; আর সেই সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উক্তি "সর্বোপরি...রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছি" বাস্তবরূপ দিতে হবে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উল্লিখিত বিশ্বাসসমূহ অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানবিক যে কোনো মানদণ্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
কার্যনির্বাহক কমিটি ২০১২-২০১৪

সভাপতি	:	ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি	:	এম. এ. সাত্তার ভূঁইয়া
		ড. জামালউদ্দিন আহমেদ
		শামীমা আখতার (সদ্য প্রয়াত)
		ড. মো. আলী আশরাফ
		ড. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
কোষাধ্যক্ষ	:	মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ
যুগ্ম-সম্পাদক	:	ড. সেলিম রায়হান
		বদরুল মুনির
সহ-সম্পাদক	:	ড. শাহ মোঃ আহসান হাবীব
		মো. সাদিকুর রহমান ভূইয়া
		মো. মোজাম্মেল হক
		মো. মঈন উদ্দিন
		আসজাদুল কিবরিয়া
সদস্য	:	খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ
		অধ্যাপক হান্নানা বেগম
		মনজু আরা বেগম
		এ.জেড.এম. সালেহ্
		ড. মো. আইনুল ইসলাম
		মীর হাসান মোহাঃ জাহিদ
		ড. শফিক উজ জামান
		ড. মো. লিয়াকত হোসেন মোড়ল
		মো. মোস্তাফিজুর রহমান সরদার
		মাহতাব আলী রাশেদী
		ড. মো. আমির হোসেন
		ড. মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
		মনিরুল ইসলাম
		মেহেরুননেছা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org